# উৎসর্গ

স্বর্গীয় নানী জাহানারা বেগম-এর স্মৃতির উদ্দেশ্যে,
যাঁর জাদুকরী গল্প আর মিষ্টি ঝগড়াগুলোতেই
বোনা হয়েছিল আমার শৈশব।
তোমার শেখানো সেই রূপকথাগুলো আজ তুলে দিলাম
'রূপকথার নীল নকশা'র পাতায়।

# সূচীপত্র


উত্তরের রূপকথা ..... ৭-৮
শব্দহীন উপত্যকা ..... ৯-১১
কাঁচের পাহাড়ের বন্দিনী ..... ১২-১৫
বনছায়ার জাদুর বাঁশি ..... ১৬-১৯
অচিনপুরের জাদুর চাবি ..... ২০-২৬
ধূমকেতুর শেষ বার্তা ..... ২৭-৩০
জলপরীর চোখের জল ..... ৩১-৩৪
মায়াবনের ছোট মালী ..... ৩৫-৩৭
পুরনো ডায়েরির রাজত্ব ..... ৩৮-৪৭
রুপালি ডানার ঘোড়া ..... ৪৮-৫৪
কাগজের নৌকা ও কালিন্দীর জল ..... ৫৫-৫৬
আয়নার ওপিঠের রাজকন্যা ..... ৫৭-৫৮
নিঃশব্দ অরণ্যের বাঁশিওয়ালা ..... ৫৯-৬০
শেষ চিঠির রূপকথা ..... ৬১-৬২
প্রথম আঁচড় এবং অলৌকিক পরিবর্তন ... ৬৩-৬৪
জাদুকরের আগমন ও শর্তের বেড়াজাল ... ৬৫
রোমাঞ্চ ও স্মৃতির মহোৎসব ..... ৬৬
চূড়ান্ত সংঘাত ও চুরমার নীল নকশা ..... ৬৮
চন্দ্রাবতীর রুপালি সুতো ..... ৬৯-৭০
তাম্রলিপির গোলকধাঁধা ..... ৭১
মায়ামৃগের শেষ নূপুর ..... ৭২
নক্ষত্রমালার পিয়ানো ..... ৭৩
চিত্রশালার জীবন্ত ক্যানভাস ..... ৭৪
সুবর্ণরেখার জাদুকরী ঘড়ি ..... ৭৫
নীলপদ্মের মায়াকানন ..... ৭৬
শঙ্খনাদের প্রাচীন লিপি ..... ৭৭
ধূমকেতুর জাদুকরী আয়না ..... ৭৮
কালপুরুষের ছায়ালিপি ..... ৭৯

# উত্তরের রূপকথা

উত্তরের হিমেল হাওয়ায় যখন পিঠ ঠেকে যেত নানী-দাদীর কোলঘেঁষা কাঁথায়, তখন শুরু হতো রূপকথার ঝাঁপি। বাইরে তখন ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক আর বাঁশঝাড়ের কানাকানি। আমাদের ঘুম পাড়াতে তারা শোনাতেন কুলিক নদীর পাড়ের জীন-পরীর কিচ্ছা, কাঞ্চনজঙ্ঘার মায়াবী রূপ আর হারানো রাজপুত্রের কথা। সেইসব স্মৃতিমাখা গল্প নিয়ে এই ‘উত্তরের রূপকথা’।

• কুলিক নদীর মায়াবতী: ঠাকুরগাঁওয়ের পাশ দিয়ে বয়ে চলা কুলিক নদীর তলদেশে এক রূপবতী জলপরী বাস করে। শোনা যায়, গভীর পূর্ণিমায় সে রুপোর থালায় হীরা নিয়ে পাড়ে উঠে আসে। কোনো সৎ মানুষ যদি সেই দৃশ্য দেখে, তবে তার অভাব আজীবনের জন্য ঘুচে যায়। তবে লোভ করলেই পরী মিলিয়ে যায় কুয়াশায়।

• হিমালয়ের প্রহরী: শীতের পরিষ্কার সকালে ঠাকুরগাঁও থেকে যখন কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায়, বুড়োরা বলেন ওটা আসলে এক বিশাল তুষারমানব। সে উত্তরবঙ্গকে হিমেল দানবদের হাত থেকে রক্ষা করে। সূর্যের প্রথম আলো যখন পাহাড়ে পড়ে, তখন মনে হয় প্রহরী তার সোনার মুকুট পরে আমাদের হাসিমুখে দেখছে।

• নেকমরদ বাজারের জীন: বহু বছর আগে নেকমরদের মেলায় এক জীন আসত মানুষের বেশে। সে কারো ক্ষতি করত না, বরং গরিবদের ঝোলায় অলক্ষ্যে মোহর ভরে দিত। আজও লোকে বিশ্বাস করে, মেলায় ভিড়ের মাঝে হঠাৎ দেখা পাওয়া সেই অচেনা দয়ালু বৃদ্ধটি আসলে কোনো সাধারণ মানুষ নয়।

• পিঠা আর ডাইনী বুড়ি: পৌষের রাতে যখন নানী পিঠা বানাতেন, বলতেন—”বেশি শব্দ করো না, ডাইনী বুড়ি এসে ভাগ বসাবে।” উত্তরের কনকনে শীতে ডাইনীরা নাকি ধোঁয়া দেখে বাড়িতে হানা দেয়। তাদের হাত থেকে বাঁচতে পিঠার প্রথম অংশটি আগুনের খোলায় উৎসর্গ করতে হয়।

• টাঙ্গন নদীর হারানো নৌকা: টাঙ্গন নদীর এক বাঁকে নাকি এক সোনার নৌকা ডুবে আছে। এক মাঝরাতে এক মাঝিকে এক রাজকন্যা ডেকে বলেছিল নৌকাটি তুলতে। কিন্তু শর্ত ছিল—পেছনে ফিরে তাকানো যাবে না। মাঝি মাঝপথে কৌতূহলী হয়ে তাকাতেই নৌকাটি পাথর হয়ে অতলে তলিয়ে যায়।

• সিন্দুরমতির অলৌকিক দীঘি: উত্তরের এক গ্রামে সিন্দুর ও মতি নামের দুই বোন ছিল। খরায় যখন মাটি ফেটে চৌচির, তখন তারা দীঘির মাঝখানে গিয়ে দেবতার কাছে প্রার্থনা করে। হঠাৎ জল উছলে ওঠে এবং তারা দীঘির সাথে মিশে যায়। আজও সেই দীঘির জল কখনো শুকায় না।

• বাঁশঝাড়ের ভূত ‘পিচাশ’: গ্রামের শেষে যে ঘন বাঁশঝাড়, সেখানে নাকি ‘বাঁশ-ভূত’ থাকে। রাতে পথিকের সামনে লম্বা বাঁশ নুইয়ে পড়ে পথ আগলে ধরে। ভয় না পেয়ে যদি কেউ সাহসের সাথে “জয় ঠাকুর” বলে ডাক দেয়, তবে ভূতটি পথ ছেড়ে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়।

• রাজা টঙ্কনাথের গুপ্তধন: রাণীশংকৈলের রাজা টঙ্কনাথের প্রাসাদের নিচে নাকি এক বিশাল সুড়ঙ্গ আছে যা সরাসরি হিমালয় পর্যন্ত বিস্তৃত। লোককথা অনুযায়ী, প্রজাদের বাঁচাতে রাজা তার সমস্ত ধনসম্পদ সেখানে লুকিয়ে রেখেছিলেন। আজও রাজবাড়ির ভাঙা দেয়ালে কান পাতলে সেই মোহরের ঝনঝনানি শোনা যায়।

• মেঘের ভেলায় রাখাল ছেলে: উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ মাঠের ওপর দিয়ে যখন সাদা মেঘ ভেসে যায়, দাদীরা বলতেন ওটা এক রাখাল ছেলের ভেলা। সে একবার বাঁশি বাজিয়ে এতই মুগ্ধ করেছিল যে, মেঘেরা তাকে কোলে করে স্বর্গে নিয়ে গিয়েছিল। বৃষ্টির দিনে তার বাঁশির সুর বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দে শোনা যায়।

• জাদুর হাড়ি ও শীতের বুড়ি: অনেক আগে এক বুড়ি শীতের রাতে কাঁপতে কাঁপতে এক গরিব চাষির ঘরে আশ্রয় চায়। চাষি তাকে আদর করে যত্ন নিলে বুড়ি তাকে একটি মাটির হাড়ি উপহার দেয়। সেই হাড়ি থেকে সারাজীবন গরম গরম ভাপা পিঠা বের হতো। বুড়ি আসলে ছিল শীতের দেবী।

# ‘শব্দহীন উপত্যকা’

এক শান্ত পাহাড়ি উপত্যকার কোলে ছিল একটি গ্রাম, যার নাম ‘নিশ্চিন্তপুর’। সেই গ্রামের মানুষেরা কখনো কথা বলে না। সেখানে পাখির কলকাকলি নেই, ঝরনার শব্দ নেই, এমনকি বাতাসের শনশন শব্দও যেন সেখানে এসে থমকে যায়। নিশ্চিন্তপুরের প্রতিটি মানুষের গলায় থাকতো একটি করে নীল পাথর ঝোলানো। এই পাথরগুলো ছিল গ্রামের প্রাচীন শাসক ‘মৌনরাজ’-এর দেওয়া। গ্রামের কঠোর নিয়ম ছিল যে, কেউ যদি মুখ দিয়ে একটি শব্দও উচ্চারণ করে, তবে সেই নীল পাথর জ্বলে উঠবে এবং তাকে চিরকালের জন্য উপত্যকার বাইরে এক অন্ধকার গুহায় নির্বাসিত করা হবে। এই গ্রামে বাস করত সাফি নামের এক সাহসী তরুণ। সাফির মন ছিল সবসময় কৌতূহলী। সে ভাবত, কেন মানুষ কথা বলতে পারবে না? কেন চোখের ইশারায় আর হাতের সংকেতে আমাদের জীবন কাটাতে হবে? মানুষের মনের কথাগুলো যখন গলার কাছে এসে দলা পাকিয়ে যায়, তখন তা পাথরের মতো ভারী হয়ে ওঠে। সাফি বুঝতে পারত, কথা বলতে না পারার এই কষ্ট গ্রামের মানুষকে ভেতরে ভেতরে পাথর করে দিচ্ছে।

একদিন সাফি উপত্যকার নিষিদ্ধ সীমানায় বেড়াতে গেল। গ্রামের বৃদ্ধরা সবসময় বলত, সীমানার ওপারে গেলে জাদুকর মৌনরাজের অভিশাপ লাগবে। কিন্তু সাফি আজ স্থির করেছে সে সত্য জানবেই। বনের গভীরে হাঁটতে হাঁটতে সে এক প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পেল। সেই মন্দিরের দেওয়ালে খোদাই করা ছিল অনেক ছবি। সে দেখল, অনেককাল আগে এই উপত্যকার মানুষ গান গাইত, হাসত আর প্রাণ খুলে কথা বলত। কিন্তু তারপর একদিন মৌনরাজ নামের এক চতুর জাদুকর এসে মানুষের শব্দের শক্তি চুরি করে নিল। সে জানত, মানুষ যদি কথা বলে তবে তারা এক হতে পারবে, আর তারা যদি এক হয় তবে জাদুকরকে কেউ মানবে না। তাই সে মানুষের ভয়কে কাজে লাগিয়ে এই নীল পাথরের ফাঁদ পেতেছিল। সাফি যখন এই সত্য জানতে পারল, তার বুকের ভেতরটা অপমানে

আর রাগে জ্বলে উঠল। সে ভাবল, যে শব্দ আমাদের পরিচয়, সেই শব্দ ছাড়া আমরা তো কেবল চলন্ত পুতুল।

সাফি যখন গ্রামের দিকে ফিরছিল, তখন তার মাথার ওপর এক বিশাল কালো বাজপাখি চক্কর দিচ্ছিল। সেই পাখিটি ছিল মৌনরাজের গুপ্তচর। গ্রামের ঠিক মাঝখানে যখন সাফি এসে পৌঁছাল, তখন সে দেখল সবাই চুপচাপ নিজেদের কাজ করছে। কেউ কারো দিকে তাকিয়ে হাসছে না, কথা তো দূরে থাক। হঠাৎ সাফির ভেতর থেকে এক তীব্র চিৎকার বেরিয়ে আসতে চাইল। সে তার গলার নীল পাথরটি টেনে ছিঁড়ে ফেলল। পাথরটি মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে দপ করে এক নীল আলো জ্বলে উঠল এবং আকাশ কালো মেঘে ঢেকে গেল। গ্রামের মানুষ ভয়ে কুঁকড়ে গেল, কারণ তারা জানত নীল পাথর ছিঁড়ে ফেলার শাস্তি কী। জাদুকর মৌনরাজ তার মায়াবী মেঘের রথে চড়ে নিচে নেমে এল। তার চোখ দিয়ে আগুন বেরোচ্ছিল। সে কর্কশ স্বরে বলল, “ওরে মূর্খ বালক! তুই নিয়ম ভেঙেছিস। তোকে এখনই এই উপত্যকা থেকে চিরতরে মুছে দেওয়া হবে।”

কিন্তু সাফি এবার আর ভয় পেল না। সে আকাশের দিকে মুখ করে পূর্ণ শক্তিতে চিৎকার করে বলল, “না! আমরা আর চুপ থাকব না!” তার সেই বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর পাহাড়ের গায়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে এল। গ্রামের মানুষ অবাক হয়ে দেখল, সাফির কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তার চারপাশের বাতাস কাঁপতে শুরু করেছে। সাফি আবার চিৎকার করে বলল, “তোমরা সবাই পাথরগুলো ছুড়ে ফেলো! কথা বলো! আমাদের শব্দের মধ্যেই আমাদের মুক্তি!” প্রথমে কেউ সাহস করল না, কিন্তু সাফির চোখে সেই অদম্য সাহস দেখে গ্রামের এক ছোট মেয়ে তার গলার পাথরটি খুলে মাটিতে আছাড় দিল। মুহূর্তের মধ্যে যেন এক জাদুকরী বিস্ফোরণ ঘটল। একের পর এক মানুষ তাদের গলার পাথরগুলো ছিঁড়ে ফেলতে লাগল। সবাই মিলে যখন একসঙ্গে নিজেদের নাম আর মুক্তির কথা চিৎকার করে বলতে শুরু করল, তখন সেই সম্মিলিত শব্দের আঘাতে জাদুকরের মায়াবী রথ ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

জাদুকর মৌনরাজ বুঝতে পারল যে, মানুষের একতার শব্দের কাছে তার অন্ধকার জাদু অত্যন্ত দুর্বল। সে কুয়াশার মতো মিলিয়ে যেতে লাগল। নিশ্চিন্তপুর গ্রামটি মুহূর্তের মধ্যে বদলে গেল এক কোলাহলপূর্ণ স্বর্গে। যে ঝরনাটি পাথর হয়ে ছিল, সেটি কলকল শব্দে বইতে শুরু করল। পাখিরা ডানা ঝাপটে গান ধরল। গ্রামের মানুষ একে অপরকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল—আহ্লাদে আর পরম শান্তিতে। তারা আবিষ্কার করল যে, এতদিন তাদের গলার নীল পাথরগুলো আসলে তাদের মনকে বন্দি করে রেখেছিল। সাফি তখন পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে দেখছিল তার গ্রামটি কীভাবে প্রাণ ফিরে পাচ্ছে। সে জানত, এই লড়াই কেবল শব্দের জন্য ছিল না, এটি ছিল মানুষের মৌলিক অধিকার আর সত্য খোঁজার লড়াই। নিশ্চিন্তপুর থেকে তার নাম বদলে হলো 'মুক্তকণ্ঠ'। সাফির সাহসিকতার গল্প প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বলা হতে থাকল। সেই থেকে মানুষ শিখল যে, চুপ থাকা সবসময় শান্তির লক্ষণ নয়; কখনো কখনো অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলাই হলো আসল বীরত্ব। সাফি আর কোনো সাধারণ তরুণ রইল না, সে হয়ে উঠল সেই উপত্যকার স্বাধীনতার এক জীবন্ত কিংবদন্তি।

# কাঁচের পাহাড়ের বন্দিনী

সিনথিয়া যখন কাঁচের পাহাড়ের সেই ধুলোবালির ওপর দাঁড়িয়ে পেছনে তাকাল, সে দেখল ধ্বংসস্তূপের মাঝখানে সেই সোনালি চড়ুইটি আবার এসে তার কাঁধে বসেছে। পাখিটার ডানা এখন আর ভাঙা নয়, বরং চাঁদের আলোয় তা রুপোলি আভা ছড়াচ্ছে। সিনথিয়া অনুভব করল, এই পাহাড় জয়ের যাত্রাটি কেবল এক দিনের ছিল না, এটি ছিল তার আজন্মের জড়তা কাটিয়ে ওঠার এক মহাকাব্য। সে বুঝতে পারল, জাদুকর 'অবিশ্বাস' আসলে বাইরের কেউ ছিল না, সে ছিল সিনথিয়ার নিজের মনের এক ছায়া, যা তাকে সবসময় বলত যে সে পারবে না। সেই ছায়াকে জয় করাটাই ছিল পৃথিবীর সবথেকে কঠিন কাজ। বনের ভেতরের সেই নিস্তব্ধ রাতে সিনথিয়া শুনতে পাচ্ছিল গাছের পাতার মর্মর ধ্বনি, যা যেন তাকে এক নতুন জীবনের কথা শোনাচ্ছিল। সে যখন হাঁটতে শুরু করল, তার পায়ে বিঁধে থাকা কাঁচের ছোট ছোট কুচিগুলো আর ব্যথা দিচ্ছিল না, বরং সেগুলো তাকে মনে করিয়ে দিচ্ছিল যে বাধা জয় করার চিহ্নগুলো আসলে বীরত্বের অলঙ্কার।

বনের পথ ধরে এগোতে এগোতে সে এক বিশাল আয়নার মতো দিঘির সামনে এসে দাঁড়াল। দিঘির জলে নিজের প্রতিচ্ছবি দেখে সিনথিয়া চমকে উঠল। তার অবয়ব বদলে গেছে; তার চোখে এখন আগ্নেয়গিরির মতো তেজ আর শান্ত সমুদ্রের মতো গভীরতা। সে বুঝতে পারল, কাঁচের পাহাড়ে বন্দি থাকার সময় সে যে একাকিত্ব ভোগ করেছিল, সেটাই তাকে নিজের সঙ্গে কথা বলতে শিখিয়েছে। বিপদে পড়লে মানুষ যেমন তার সুপ্ত প্রতিভা খুঁজে পায়, সিনথিয়াও ঠিক তাই পেয়েছে। সে ভাবল, যদি সে সেই বন্দিত্বে না পড়ত, তবে কোনোদিনও জানত না যে সামান্য বালু আর ছিঁড়ে যাওয়া কাপড়ের টুকরো দিয়েও ইতিহাস গড়া যায়। জীবনের প্রতিকূলতাগুলো আসলে আমাদের ধ্বংস করতে আসে না, বরং আমাদের ভেতরের ঘুমন্ত সিংহকে জাগিয়ে তুলতে আসে। সিনথিয়া দিঘির জল দিয়ে তার মুখ ধুয়ে নিল এবং এক বুক আত্মবিশ্বাস নিয়ে সামনে তাকাল।

গ্রামের সীমানায় যখন সে পৌঁছাল, তখন ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে। গ্রামের মানুষগুলো তাকে দেখে অবাক হয়ে গেল। তারা জানত, কাঁচের পাহাড় থেকে কেউ কোনোদিন ফিরে আসে না। সিনথিয়াকে ঘিরে ধরল পাড়ার ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা। তারা জানতে চাইল, কেমন করে সে সেই দুর্ভেদ্য পাহাড় জয় করল। সিনথিয়া হাসল এবং মাটির ওপর একটি কাঠি দিয়ে একটি রেখা টানল। সে তাদের বলল যে, বাধা যত মসৃণই হোক না কেন, যদি মনের ভেতরে জেদ থাকে, তবে প্রতিটি পিছল জায়গাও সিঁড়ি হয়ে যায়। সে শিখিয়ে দিল যে, আত্মবিশ্বাস কোনো জাদুমন্ত্র নয়, এটি হলো বারবার পড়ে গিয়েও আবার উঠে দাঁড়ানোর একটি অভ্যাস। সিনথিয়ার এই জয় কেবল তাকে নয়, পুরো গ্রামকে বদলে দিল। যারা আগে সামান্য বিপদে ভেঙে পড়ত, তারা এখন সিনথিয়ার গল্পের অণুপ্রেরণায় লড়তে শিখল।

কয়েক বছর পর সিনথিয়া বড় হলো, কিন্তু তার সেই সোনালি চড়ুই আর কাঁচের পাহাড়ের স্মৃতি মলিন হলো না। সে এখন পাহাড়ের পাদদেশে একটি ছোট পাঠশালা বানিয়েছে, যেখানে সে শিশুদের কেবল বইয়ের পড়া নয়, জীবনের পাঠ দেয়। সে তাদের শেখায় যে, প্রত্যেকের জীবনেই কোনো না কোনো সময় ‘অবিশ্বাস’ নামের জাদুকর আসবে এবং তাদের বন্দি করতে চাইবে এক অদৃশ্য কাঁচের পাহাড়ে। কিন্তু যদি নিজের বুদ্ধিকে তলোয়ার আর ধৈর্যকে বর্ম বানানো যায়, তবে পৃথিবীর কোনো পাহাড়ই অপরাজেয় নয়। সিনথিয়ার সেই কাহিনী এখন লোকগাথা হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে গ্রাম থেকে গ্রামে। মানুষ এখন আর কাঁচের পাহাড়কে ভয় পায় না, কারণ তারা জানে, পাহাড়ের চূড়ায় বন্দি থাকা মেয়েটি আসলে কোনো রাজকুমারী ছিল না, সে ছিল প্রতিটি মানুষের মনের ভেতরে লুকিয়ে থাকা সেই সাহস, যা একবার জেগে উললে পুরো জগতকে জয় করতে পারে। সিনথিয়ার জীবন এখন এক সার্থক রূপক, যা বারবার মনে করিয়ে দেয় যে, মানুষের ইচ্ছাশক্তির কাছে পাথরও কাঁচের মতো ভঙ্গুর হয়ে যায়।

কাঁচের পাহাড়, পিচ্ছিল পথ, পায়ের তলায় ক্ষত,
পিছন পানে তাকাল মেয়ে জয়ের চিহ্ন যত।
শত্রু ছিল আপন ছায়া, মনের গহীন কোণে—
জাদুকর তো বাস করত নিজেরই সংগোপনে।
ডানা ভাঙা সেই চড়ুই আজ মেলল রুপোর পাখা,
অন্ধকারেও ধ্রুবতারা সংকল্পে রয় আঁকা।
ছিঁড়ে যাওয়া কাপড়েও লেখা হয় ইতিহাস,
ভেতরের সেই সিংহ জাগে, টুটে যায় ত্রাস।
বিঁধে থাকা কাঁচের কুচি এখন অলঙ্কার,
ভয়কে চিনে জয় করেছে নিজেরই অন্ধকার।
মাটির জেদে সিঁড়ি হয় পিছল প্রতিটি ধাপ,
ইচ্ছাশক্তি মুছিয়ে দিল নিয়তির অভিশাপ।
সে তো একা নয় আর, সে এক নতুন রূপকথা,
শিখিয়ে দিল পাথরও হয় তুচ্ছ তৃণের যথা।
পাহাড় জয়ের গল্প নয় এ— নিজের সাথে রণ,
সিনথিয়া আজ সাহসের নাম, এক উজ্জ্বল দর্পণ।

সিনথিয়া যখন বনভূমি আর লোকালয়ের সীমানায় দাঁড়িয়েছিল, তখনই সে বুঝতে পারল জাদুকর 'অবিশ্বাস' এত সহজে হার মানার পাত্র নয়। কাঁচের পাহাড়টি ভেঙে গেলেও তার মায়া তখনও বনের গাছপালার ওপর ছড়িয়ে ছিল। হঠাৎ বনের প্রতিটি গাছ সিনথিয়ার সামনে এক একটি বিশালাকার কাঁচের দেয়ালে পরিণত হলো। সে যেদিকেই যেতে চায়, নিজেরই ভীতু প্রতিচ্ছবি তাকে ব্যঙ্গ করতে থাকে। সিনথিয়া দেখল, আয়নার মতো সেই দেয়ালগুলোতে তার অতীতের সব ব্যর্থতা ফুটে উঠছে। জাদুকরের কণ্ঠস্বর বাতাসের হাহাকারের মতো ভেসে এল, "তুমি পাহাড় থেকে নেমেছ ঠিকই, কিন্তু তোমার নিজের ভয় থেকে কি মুক্তি পেয়েছ?" সিনথিয়া চোখ বন্ধ করে নিজের ভেতরের সেই স্থিরতা অনুভব করার

চেষ্টা করল। সে বুঝতে পারল, এই প্রতিচ্ছবিগুলো কেবল তখনই শক্তিশালী হয় যখন সে তাদের দিকে তাকিয়ে ভয় পায়। সে এবার কাঁচের দেয়ালগুলোর দিকে না তাকিয়ে মাটির দিকে তাকাতে শুরু করল। সে ঘাসের গন্ধ শুঁকে আর মাটির স্পর্শ অনুভব করে অন্ধের মতো এগোতে লাগল।

এই মায়া কাটিয়ে যখন সে বনের গভীরে পৌঁছাল, তখন তার সামনে এসে দাঁড়াল এক বিশাল গিরিখাত। এই খাতের ওপর কোনো সেতু নেই, শুধু নিচ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে এক উত্তাল 'সন্দেহের স্রোত'। সিনথিয়া দেখল খাতের ওপারে তার মা প্রদীপ হাতে তার জন্য অপেক্ষা করছেন। সে খাতের ধারে পড়ে থাকা পাথরগুলো কুড়িয়ে একে একে শূন্যে ছুড়ে দিতে লাগল আর নিজের মনে বলতে লাগল, "আমি পারব, কারণ আমি হার মানিনি।" বিস্ময়করভাবে, পাথরগুলো শূন্যে ভাসতে লাগল এবং একটি সিঁড়ির আকার নিল। প্রতিটি পদক্ষেপে সিনথিয়াকে লড়াই করতে হচ্ছিল নিজের মনের সাথে। সে বুঝতে পারল, জীবনের বড় বড় জয়গুলো আসলে ছোট ছোট প্রস্তুতিরই ফল। সে যখন শেষ পর্যন্ত তার বাড়ির উঠানে এসে দাঁড়াল, তখন সকালের সূর্য তার মাথায় আশীর্বাদের মতো কিরণ দিচ্ছে। সিনথিয়া দেখল, তার সেই ছোট্ট ভীতু সত্তাটি এখন এক অসীম সাহসী যোদ্ধায় পরিণত হয়েছে। সিনথিয়ার এই জয় কেবল এক পাহাড় থেকে নামার জয় ছিল না, এ ছিল নিজের ভেতরের অসীম সম্ভাবনাকে আবিষ্কার করার এক অবিস্মরণীয় গল্প। সে প্রমাণ করে দিল যে, আত্মবিশ্বাস ফিরে পাওয়া মানে হলো হারানো স্বর্গকে নতুন করে জয় করা।